প্রথম অধ্যায়

বেলায় বেলায় ধারালো সময় আসে – অরুণ মিত্র

“আলো আর অন্ধকারের সমান টান না থাকলে

পা টলে যায় আমার।

আমাকে নিয়ে

তোমাদের হিসেবের সব কড়ি

তাই বাঘে খেয়ে যাচ্ছে।

মুঠো শক্ত করে

পয়জারে পেরেক ঠুকে ঠুকে

যে-ফ্রেমে গাঁথতে চেয়েছো আমাকে

দ্যাখো

তার বাইরে

হাওয়ায় উড়ছে আমার পাজামা

ছিটকে পড়ছে চপ্পল

হাত-পায়ের কাটা আঙুল।

তোমাদের বানানো ভালো

সাজানো মন্দ

এ-শরীর আর কিছুই বয় না।

স্বর্গের আর উচ্ছন্নের দুটো হা-মুখো রাস্তা

সমান আদরে সমান আদিখ্যেতায়

আমাকে ডাকছে-আয়।

যাবো না।

দুয়ের মাঝখানের এই ছোট্ট জায়গাটুকু

আমার-

এখানেই দাঁড়িয়েই আমি।"

('কবি অরুণ মিত্র বলেছিলেন')

কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত যাঁকে উৎসর্গ করে এই কবিতা লিখেছিলেন তিনি হলেন কবি অরুণ মিত্র। ১৯০৯ সালের শেষদিকে যশোরে কবি অরুণ মিত্রের জন্ম হয়। যশোর ছিল অনেকটা শহর ঘেঁষা। যদিও কবি অরুণ মিত্র শহর আর গ্রামকে কখনো বেশী আলাদা করে দেখেননি, আর তাঁকে আকর্ষণ করতো বেশী এই গ্রামীণ আবহাওয়াই। তাই তাঁর কবিতাতেও আমরা সেই গ্রামের ছবিই বেশী পাই। তাঁর শৈশব ও কৈশোর বেশীর

ভাগটাই কাটে গ্রামে, কম বয়সেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং এখানেই তাঁর লেখাপড়ার জীবন যাপন চলে। শহর এবং গ্রামকে তিনি যেমন আলাদা করে ভাবতেন না তেমনি সাহিত্যিক ও সাধারণ মানুষকেও তিনি আলাদা করে ভাবতেন না। ছোটবেলায় গ্রামে তাঁর জীবন কাটে বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন আনন্দ, যেমন মানুষের গাছের ফল চুরি, মানুষের পাঁঠা চুরি, ট্রেনে, স্টিমারে, নৌকায় হৈ হৈ করে বেড়িয়ে। তিনি নিজে যশোরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন -

"অনেকেই জানেন সেইকালের মফঃস্বল শহর মানে নগরে ও গ্রামে মেশামেশি। এখনকার মতো আধুনিকতার প্রলেপ তার উপর পড়েনি। শহরে যেমন পাকা রাস্তা ছিল (অবশ্যই পিচঢালা নয়, খোয়াই ইঁটের), তেমন ছিল মাটির কাঁচা পথ, দালানকোঠার পাশাপাশি ছিল কুঁড়েঘর, যেমন ছিল বাঁধানো ঘাটের পুকুর, তেমন খানাডোবা, আর চারিদিকেই ঝোপঝাড় গাছগাছালি, কচুবন বাঁশবন নারকেল সুপুরি তাল খেজুরের একঠেঙে জটলা। এবং শহর থেকে একটু পা বাড়ালেই নির্ভেজাল গ্রাম। ফলে আমরা গ্রামের ছেলে ছিলাম না শহরের, তা বলা কঠিন। বসবাসের অনুভূতিটাও মেলানো মেশানো ছিল। আমরা যখন দল বেঁধে বেরোতাম তখন যেমন কোনোদিন চলে যেতাম শহর কেন্দ্রে আপিস-কাছারি জর্জম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো এলাকায় অথবা ফুটবল মাঠে, তেমনি আবার কোনো দিন চলে যেতাম পাশেই গ্রামের মধ্যে। কোনো কোনো পাড়া থেকে গাঁয়ের দূরত্ব ছিল শহুরে দূরত্বের চেয়ে কম। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বেশি অভিভূত করত গেঁয়ো আবহাওয়া। কেউ কেউ বলেছেন আমার কবিতায় নাকি বাংলার জলমাটি অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে।"[১]

কিন্তু তিনি যশোরে বেশি দিন থাকতে পারেন নি। বালক বয়সেই তাঁকে চলে আসতে হয়েছে কলকাতাতে পড়াশোনার জন্য। কিন্তু কলকাতায় চলে

আসলেও তিনি কিন্তু যশোরকে কিছুতেই ভুলতে পারেননি। তিনি উপলব্ধি করেছেন এই দূরত্ব যেন তাঁদের কে আরো কাছাকাছি এনেছে। তিনি নিজেই বলেছেন -

*"কিন্তু কলকাতায় এসে যশোরের সঙ্গে আমার বাঁধনটা আলগা হওয়ার বদলে আরো শক্ত হল। তার উপর আমার টান বহুকাল পর্যন্ত অত্যন্ত তীব্র ছিল। সেই nostalgia কলকাতায় আমাকে চেপে থাকত।"*২

কিন্তু এসবের সাথে সাথে যশোরের অন্য প্রভাবও কিন্তু পরেছে তাঁর উপরে। প্রভাব বলতে, তাঁর মামাবাড়ির পরিবেশ ছিল বেশ সাংস্কৃতিক, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সেখানে আসতো, বিভিন্ন বই, গান-বাজনা এসবে ভরা থাকতো সবসময়। তিনি নিজে বলেছেন -

*"সে বাড়ির আবহাওয়া ছিল যাকে বলা যায় সাংস্কৃতিক। প্রবাসী, ভারতবর্ষ পত্রিকা আসত, গ্রামোফোন এবং গানের অনেক রেকর্ড ছিল, এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটেনিকা ছিল, আর ছিল নানারকম বই; কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গোয়েন্দা কাইনী, প্রবন্ধ। আমারও এক স্বভাবগত আকর্ষণ ছিল ঐদিকে। সুতরাং ফাঁক পেলেই আমি সেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়তাম।"*৩

এই মামাবাড়িতেই ছিল তাঁর সমস্ত বন্ধু, যাদের সে সবচেয়ে বেশি আপন বলে ভাবতেন, তাইতো যশোরে গেলেই কবি যেন নিজের প্রাণ ফেরত পেতেন। আর এই ছোটবেলা থেকেই তিনি সেই মামাবাড়িতে কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস পাঠ করতেন আর সেগুলি তাঁকে ভীষণ ভাবে আকর্ষণ করতো। শুধু তাই নয় এখান থেকেই তিনি রাজনৈতিক এবং সাম্যবাদী সংগঠনের সাথে পরিচিত হন। এও জানা যায় যে তাঁর মাসতুতো ভাই

সকুমার মিত্র ছিলেন কমিউনিস্ট সাংবাদিকের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও পত্র-পত্রিকা বের করার আগ্রহও তিনি এখান থেকেই পেয়েছেন। কারণ এই সময় বিভিন্ন তরুণ তাঁর মামাবাড়িতে আসতেন আর তাঁরা ছিলেন জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত। যা অরুণ মিত্র নিজের মধ্যে অনুভব করতেন। এখানেই শেষ নয়, তাঁর প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল এই বিপ্লবীদের পত্রিকাতেই -

"সন্ত্রাসবাদী, গান্ধীবাদী এবং সাম্যবাদী সংগঠনের সঙ্গে এদের অনেকের যোগ ছিল। তার উপর কেউ কেউ আবার সাহিত্যে উৎসাহী। যশোর জেলার অন্য অঞ্চল থেকে প্রকাশিত এক সাহিত্য-পত্রিকায় তারা জড়িত ছিল। বোধ হয় এই অনুপ্রেরণাতেই কিছুকাল পরে আমারা কয়েকজন বন্ধু মিলে কলকাতায় এক স্বল্পায়ু মাসিক পত্র বের করেছিলাম। তার আগে আমার এক কবিতা বেরিয়েছিল বিপ্লবীদের পরিচালিত কিশোর পত্র 'বেণু'তে আমার প্রথম মুদ্রিত রচনা।"[৪]

তবে এই কবিতাটির নাম কি ছিল তা কিন্তু জানা যায় না। শুধু তাই নয় কবিতাটি 'বেণু'তে ছাপা হয়েছিল কিনা তাও কিন্তু কবিও সঠিক ভাবে জানেন না। তবে কবিতাটি, কবির অনুমানে অনেকটা এরকম ছিল -

"বন্ধুরা গো বন্ধুরা মোর প্রিয়,

বিদায় মাগি বিদায় মোরে দিয়ো।

দূর গগনের আগুন কোণে বেলা শেষের আলো

রাঙিয়ে গেল এই জীবনের সকল সাদা কালো,

আলোর সুরে বেলা শেষের গান-

অঞ্জলিতে তাই করি আজ পান,

আলোর রেখার সূক্ষ গায়ক গুলি

অন্ধ তামস গুঁড়িয়ে করে ধূলি,

বেলা শেষের আলোর গানে হৃদয় নমনীয়।

আমায় এখন বিদায় দিয়ো

বন্ধুরা মোর প্রিয়।

বন্ধুরা গো, বন্ধুরা মোর প্রিয়

চোখের কোণে জমাট বাঁধে কী ও ?

এই দু-দিনের কান্নাহাসি ভিড় করে আজ বাজায় কেন বাঁশি?

অশ্রু ঝরায় গত দিনের উন্মনা হয় ভালোবাসাবাসি,

মৌচাকে আজ এক খোঁচাতেই ঝরে

মধুর ধারা প্রাণের আধার পরে।

মৌমাছি গো মধুর কাঙাল ভাই,

অবসরে কিছুই করি নাই,

মুমূর্ষ তাই এই সুযোগেই বারেক মধু পিয়ো

আর বিদায় মোরে দিয়ো

বন্ধুরা মোর প্রিয়।

বন্ধুরা গো বন্ধুরা মোর প্রিয়

ক্ষমো আবেগ এ অরক্ষণীয়।

দুঃখ সুখের স্মৃতির সাথে হয়তো মোরে তোমরা যাবে ভুলে-

ভুলো ভুলো-ভোলার মাঝেই সুখের স্বপন দুলে।

দু-দন্ড আজ ধৈর্যটুকু রাখো;

জাগছে স্মৃতি শতেক হাজার লাখো।

বেলা শেষের আলো গেল গেল,

অশ্রু নহে অশ্রু কেন ফ্যাল?

বিদায় এবার বিদায় মাগি, প্রাণের প্রীতি নিয়ো

ওগো বিদায় মোরে দিয়ো

বন্ধুরা মোর প্রিয়ো।"[৫]

এই সময় তাঁর একটি গল্পও 'কলাপী' পত্রিকায় বের হয়েছিল বলে জানা যায় কিন্তু তারও কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। যাই হোক কবিতা লেখাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন অরুণ মিত্র। আর অনেক কবিতাও তিনি এইসময় লেখেন কিন্তু সেগুলি শুধু খাতাবন্দী হয়েই থাকে। পরে সেই খাতাও হারিয়ে যায়। অরুণ মিত্র নিজেই বলেছেন-

"আরম্ভকালের পর কয়েক বছর আমি নিয়মিত যা লিখতাম, খাতাবন্দী করে রাখতাম। সে-সব রচনা তেমন কিছু হত না বোধ হয়, কিন্তু সে প্রশ্ন নিয়ে আমার মাথা ব্যথা ছিল না। লিখতেই বেশ ভালো লাগত আমার। ছাপানোর বিশেষ চেষ্টা করিনি ; শুধু আশ-পাশের দু'একজনকে শুনিয়েছি।

আমার বছর উনিশ বয়েসে একটা মোটা খাতায় অনেক কবিতা জমেছিল, সেটা বাসা বদলে কোথায় হারিয়ে যায়।"[৬]

এইভাবে অরুণ মিত্র নিয়মিত লিখতেন, আর সেই সময় সকলের মতো তাঁরও প্রথম প্রেম ছিল সেই বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে একবার স্বচক্ষে দেখবেন বলে নিজের হাতে পড়া সোনার ঘড়িটা যে কখনো হারিয়ে ফেলেছেন নিজেও বুঝতে পারেননি। অরুণ মিত্রের কাছে সাহিত্য, জীবন বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। জীবনকে বাদ দিয়ে তিনি কিছু ভাবতে পারতেন না। তিনি মনে করতেন জীবনের বিভিন্ন অভিঘাতেই কবিতা তথা সাহিত্যের জন্ম এবং সাহিত্যিক-কেউ কোন উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত ভাবতেন না। আর সেই কারণেই তাঁর নিজের চরিত্রেও সেই কথারই ছাপ পাওয়া যায়। তিনি কাউকে কখনো ছোটো করে দেখতেন না। তাঁর চেয়ে কম বয়সী এবং অজ্ঞাত অনেক ব্যক্তিকেউ সমীহ করে চলতেন এবং তাঁদের কবিতা প্রকাশের সুযোগ করে দিতেন এবং তাদের সাথে মিশতেও কোথাও দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি আবার কোনো কিছুকে ভয়ও করতেন না। তাইতো দিনেশ দাসের 'কাস্তে' কবিতা যখন কেউ ছাপতে চাইছিল না এমন কি দিনেশ দাসের নিজেদের রাজনৈতিক পত্রিকাও না তখন কিন্তু এই অরুণ মিত্র তৎকালীন 'আনন্দ বাজার' পত্রিকার সম্পাদক সেই কবিতা

ছাপেন। আসলে সেই সময় এই সব কবিতা ছাপা-তো আজকের মতো এতটা সহজ ছিল না। অরুণ মিত্র নিজেও সেই সব সমস্যার সন্মূখীন হয়েছেন। তিনি নিজেও বলেছেন -

*"এখনকার সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড তফাৎ ছিল আমাদের জীবন-অনুভূতিতে। পরাধীনতার যন্ত্রণা এখন নেই যা ছিল আমাদের প্রতিদিনের যন্ত্রণা। পরশাসন এবং নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা ও সংগ্রাম ছায়া ফেলে থাকত আমাদের পুরো মানসপটে। এই সমস্ত নিয়ে যে জীবন, সাহিত্যকে তারই এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে আমার মনে হ'ত তার বেশী নয়।"*৭

এই মামাবাড়িতে অরুণ মিত্রের আরো এক ব্যক্তির সাথে পরিচয় ঘটেছিল যার কাছে তিনি এই সাহিত্য রচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি হলেন ফণিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এনি মামাবাড়িতে আগত প্রায় সকলেরই শিক্ষক ছিলেন, তাই তাঁকে সবাই 'স্যার' বলে ডাকত, কিন্তু অরুণ মিত্র তাঁর ছাত্র নাহলেও তিনিও তাঁকে 'স্যার' বলেই ডাকতেন। তিনি নিজে উপন্যাস ও গল্প লিখতেন। 'কল্লোল' ও 'ভারতবর্ষে' তাঁর লেখা ছাপানো হতো বলে জানা যায়। কিন্তু তাঁর লেখার মান কী ছিল তা নিয়ে কবি কোনো মন্তব্য না করলেও তাঁর লেখা যে কবিকে অনুপ্রেরণা দিত সে কথা কিন্তু কবি নিজেই বলেছেন -

*"তাঁর রচনার গুণাগুণ যাই হোক, সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এক জীবন্ত আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। আমার মনে আছে একবার তিনি কয়েকদিন কলকাতায় কাটিয়ে ফিরে গিয়ে আমাদের কাছে দিনেশ দাসের কল্লোলী আড্ডার বিবরণ দিলেন। আমরা মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে শুনলাম।"*৮

এভাবে পরাধীনতার গ্লানি নিয়েই বড় হয়ে ওঠেন অরুণ মিত্র। বঙ্গবাসী কলেজে তাঁর অনার্স না রাখার কারণটা কিন্তু তাঁর নিজের স্বভাবের দোষ ছিল না, তিনি যদিও বিধিবদ্ধ লেখাপড়ার চেয়ে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতি বেশি ঝুঁকে থাকতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অসুবিধাটা হয়েছিল তাঁর বাবার দিকথেকে। তাঁর বাবা কোন এক মামলায় তাঁকে অনেক ছোটাছুটি করিয়েছিল, এতে অরুণ মিত্র খুব তিতিবিরক্ত হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে বাড়ির সবার সাথে তাঁর প্রায় খারাপ সর্ম্পক হয়েযায় একমাত্র মা ছাড়া। তাঁর এইসময়ের ছবি ধরা পড়েছে অবন্তীকুমার সান্যালের "Arun Mitra : Makers of Indian Literature" গ্রন্থে-

*"Being the eldest son of the family matters relating to property, leading to the botheration of litigation and rescutting in mental tension. As a result, he was extremely disgusted with family affairs and virtually severed all connection having a sort of apathy towards the established teaching curriculum since his boyhood, Arun was very irregular in his class attendance and careless in his studies. His interest was in subjects outside the prescribed texts."*৯

এই স্নাতক পরীক্ষা শেষ করেই তিনি 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজে যোগ দেন। তখনও কিন্তু তিনি ছাত্রই, কিন্তু ছাত্র হলেও তাঁর মাথায় যে ভিড় করে থাকে অন্যকিছু; দেশে তখন বিভিন্ন আন্দোলন চলছিল তা ছাড়াও যেটা ছিল সবচেয়ে গুরত্ব পূর্ণ তা হল ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়। তিনি নিজে সেই সময়ের কথা বলেছেন এভাবে-

"সংবাদপত্রে কাজ করার জন্য জাতীয় আন্দোলন ছাড়াও যে ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার সুযোগ আমার হয়েছিল, তা হল ফ্যাসিজমের অভ্যুদয়।

*কীভাবে সারা পৃথিবী এক ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে চলেছে তা দিনের পর দিন যেন চলচ্চিত্রের মত চোখের সামনে দেখেছি। বিপদটা অবশেষে এসেই পড়ল, বেঁধে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে আমার দৈনিক সাংবাদিকতার সমাপ্তি ঘটে। আনন্দবাজার পত্রিকার কার্যালয়, তখন বর্মন স্ট্রিটে, আনন্দবাজারের পদত্যাগী সম্পাদক ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'অরণি'। সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত এই সাপ্তাহিকের সঙ্গে গোরা থেকেই আমার যোগ ছিল, এখন আমি পুরোপুরি তার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। সে আর এক উদ্দিপনাময় অভিজ্ঞতা।"*১০

ফ্যাসিজম নিয়ে সেইসময় সমস্ত দুনিয়া জুড়ে কাঁপাকাঁপি চলছে, পাশ্চাত্য বিভিন্ন শিল্পি, সাহিত্যিক তার বিরুদ্ধে যে যেমন ভাবে পারে সে ভাবে লড়েছেন। বাংলা সাহিত্যেও কিন্তু আনিয়ে কম কথা হয়নি এছাড়াও এনিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছিল শুধু তাই নয় গড়ে উঠেছিল ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পি সংঘ। তাতে অনেকেই যোগ দিয়েছিল, অরুণ মিত্র তার ব্যতিক্রম ছিল না। অরুণ মিত্রের ফ্যাসিস্ট বিরোধী হওয়ার ইতিহাস তরুণ সান্যাল বলেছেন এভাবে-

"বিশ্বে যে সভ্যতার পিলসুজদের তলায় অন্ধকার দূর করার জন্য লড়াই শুরু হয়েছিল, সে লড়াই চলছিল দেশে দেশে। বৃটিশ তরুণ কবি কর্ণকোড হিস্পানী গৃহযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, 'কমিউনিজম ওয়াজ আওয়ার ওয়েকিং টাইম'। ঐ ওয়েকিং টাইমেই এরাজ্যেও বাংলা ভাষায় প্রগতি সাহিত্য, ফ্যাসিবিরোধী

*সাহিত্য, গণনাট্য আন্দোলন এই 'বিস্তীর্ণ প্রান্তরে' যোদ্ধাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির অস্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিল। অরুণ মিত্র তখনই দীক্ষিত হয়েছিলেন।"*১১

আসলে অরুণ মিত্র মানতেন যে, শিল্প, সাহিত্য এসব মানুষকে নিয়ে তাই যখন মানব মূল্য খর্ব হয় তখন এই শিল্পি, সাহিত্যিকদের নৈতিক কর্তব্য এই মানব মূল্যকে রক্ষা করা। তাই তিনি বলেন-

*"শিল্প সাহিত্য সৃজন যে যৌথ উদ্যমের বিষয় নয়, একক সাধনার বস্তু সে-ধারণা অধিকাংশের মত আমারও ছিল। এই উদ্যম ছিল শিল্পী ও সাহিত্যিকের বিবেকের দায়, মানব মূল্যকে রক্ষার প্রয়াস।"*১২

আমরা সকলেই জানি এই মানব মূল্যকে রক্ষা করার জন্য অরুণ মিত্র যে পথ বেছে নিয়েছিলেন তা হল কবিতা। আর তাঁর কবিতার বিষয় কী ছিল, সেই সর্ম্পকে বলতে গিয়ে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী খুব সুন্দর করে বলেছেন-

"কী নিয়ে কবিতা লেখেন অরুণ মিত্র? লেখেন তাঁরই চারপাশের জগৎ ও জীবন নিয়ে। তাঁর চেনা পরিবেশ ও চেনা মানুষ নিয়ে। পরিবেশের সঙ্গে মানবজীবনের দ্বন্দ্ব ও মিলন নিয়ে। মানুষের যন্ত্রণা ও স্বপ্ন নিয়ে। আবার এই সমস্ত কিছুই তিনি এমনভাবে লেখেন যে, তাঁর কবিতা পড়তে-পড়তে আমাদের মনে হয় যেন নিজেরই সঙ্গে অনুচ্চ গলায় কথা বলছেন তিনি। সত্যিই তাঁর গলা কখনও উঁচু পর্দায় ওঠে না। অথচ নিচু গলায় কথা বলেও কবিতাকে দিয়ে সেই কাজটা তিনি খুব সহজে করিয়ে নেনে, যে-কাজ করাতে গিয়ে আমাদের ঘুম ছুটে যায়।

কাজটা কী, তাও তো আমরা জানি। নম্র ও শান্ত একটি আলোর শিখাকে দু'হাতে আগলে রাখা। সে-আলো আশার আলো, বিশ্বাসের আলো। নব্বই বছর বয়সেও যাঁর

কবিতা থেকে এত আশা, এত বিশ্বাস আর জীবনের প্রতি এত আনুগত্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে,"[১৩]

এখন আমরা কবি অরুণ মিত্রের সেই কবিতার দিকে যাব, যা দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের নাম কে স্বর্ণাক্ষরে খচিত করে গিয়েছেন। কবি অরুণ মিত্র ছিলেন স্পষ্ট বক্তা। তিনি কখনো কোন আড়ালতার আশ্রয় নেননি। নিজের কথাকে সরাসরি বলে গেছেন কবিতায়। আমরা সকলেই জানি তাঁর জীবনের একটা অংশ কাটে ফ্রান্সে, ফলে তার প্রভাবও কিন্তু তাঁর কবিতায় পড়ে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা' ১৯৪৩-এ প্রকাশ পায়। কিন্তু অরুণ মিত্রের কবিতা নিয়ে আমরা যে যাই বলি না কেন, তিনি নিজে কিন্তু তাঁর কবিতা নিয়ে প্রথম থেকেই খুঁতখুঁতে স্বভাবের ছিল। তিনি নিজে বলেছেন -

"আমি আমার কবিতায় গোরা থেকেই একটা পথ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলাম। সেক্ষেত্রে আমার ১৯৪৮-৫১ পর্যন্ত ফ্রান্সের জীবন এবং ফরাসী কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা আমাকে অনেকটা সাহায্য করেছিল। অবশ্য চেষ্টাটা তার আগের থেকেই চলছিল। আমি ক্রমশ আর চিৎকার পছন্দ করছিলাম না। উচ্চকণ্ঠ রাজনৈতিক কবিতা থেকে বদলে নিতে চাইছিলাম আমার উচ্চারণের-ভঙ্গি। তাতে সমসাময়িকতার ছোঁওয়া ছিল, কিন্তু কেন জানিনা আমি সেটাতেও খুব সন্তুষ্ট ছিলাম না।' (দেশ, ১৭ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ-২৬, আর একবার শুরু করলে কবিতাই লিখব)।"[১৪]

কিন্তু তাঁর এই বদল তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ থেকে লক্ষ করা যায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থে আমরা কিন্তু রাজনীতির পূর্ণ প্রভাব লক্ষ করতে পারি। প্রথম কাব্যগ্রন্থের 'লাল ইস্তাহার' তার উল্লেখযোগ্য নির্দেশন। কিন্তু এই কবিতায়

যাবার আগে আমরা এই কাব্যগ্রন্থের ‘ভূমিকা’ কবিতায় দেখি সেখানে কবি যেন ‘লাল ইস্তাহার’ কবিতারই ভূমিকা লিখেছেন, কেন আমরা নতুন লাল ইস্তেহার পড়ব, তার কারণ তিনি যেন সেই ‘ভূমিকা’তেই বলে দিলেন -

“প্রান্তরে কোনো আলেয়া কোথাও গিয়েছে নিভে-

অস্থির দিন এসেছে বুঝি,

স্বপ্ন-শহর চূর্ণ তারায় ছিটিয়ে দিয়ে

রৌদ্রের ডাক হটাৎ এল।

বেলায় বেলায় ধারালো সময় আসে,

স্টিলের কুঠিতে কঠোর পরিক্রমা,

নগণ্য রাত তন্দ্রায় গেল মুছে,

আশু ইতিহাস শিথিলস্মৃতি।”

(‘ভূমিকা’, ‘প্রান্তরেখা’)

এই যে ‘বেলায় বেলায় ধারালো সময়’ আসছে একে মোকাবিলা করার জন্যই যেন পরবর্তী কবিতা ‘লাল ইস্তাহার’। সেখানে তিনি বললেন-

“প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার ?

লাল অক্ষরে আগুনের হলকায়

ঝলসাবে কাল জানো !

(আকাশে ঘনায় বিরোধের উত্তাপ,

ভোঁতা হয়ে গেছে পুরনো কথার ধার।)

যুগান্ত উৎকীর্ণ : এখনি পড়ো

নতুন ইস্তেহার।

--- --- ---

প্রচীরপত্রে অক্ষত অক্ষর

তাজা কথা কয়, শোনো;

কখন আকাশে ভ্রুকুটি হয় প্রখর

এখন প্রহর গোনো।

উপোসী হাতের হাতুড়িরা উদ্যত,

কড়া-পড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার;

দেবতার ক্রোধ কুৎসিত রীতিমতো;

মানুষেরা, হুঁশিয়ার !

লাল অক্ষরে লটকানো আছে দ্যাখো

নতুন ইস্তাহার।"

('লাল ইস্তাহার', 'প্রান্তরেখা')

নতুন সময়ের বার্তা বয়ে এনেছে এই কবিতা। কবি এখানে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন দেবতার বিরুদ্ধে, শুধু তাই নয় তিনি এও বিশ্বাস করেন যে আজ আর দেবতা জিততে পারবে না তাইতো তিনি বলেছেন-

"শক্ত মুঠোয় স্বর্গ ছিনিয়ে নেওয়া

দেবতারা পারে ঠেকাতে আর কি বলো ?"

('লাল ইস্তাহার', 'প্রান্তরেখা')

মানুষ জেগে উঠেছে, চারিদিকে আজ বিরোধ, মানুষ আজ মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিতে চায়। তাই পুরনো সমস্ত মতবাদ, দ্বিধা, দন্ধকে ভেঙে মানুষ আজ দীক্ষিত হয়েছে নতুন মন্ত্রে, মানুষের চোখ ফিরেছে নতুন ইস্তাহারে। হাতিয়ার প্রস্তত আছে, দেবতাদের কিরীট আজ টলোমলো। এই কবিতা সর্ম্পকে দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন -

"ফ্যাসিবাদ থেকে বিশ্বযুদ্ধে পৌঁছে মানবজীবনের যে তালভঙ্গ ঘটে গেল, কবি অরুণ মিত্র তার দ্রষ্টা। ১৯৩১ এ প্রাপ্তবয়স্কতার প্রথম স্তরেই আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে জীবন দেখতে শুরু করা এবং সেই সময়ের আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ – তাঁর মার্কসীয় চিন্তা-পদ্ধতি ও সোভিয়েট সমাজতন্ত্রে আস্থা- অরুণ মিত্রকেও নিয়ে গেল সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও চেতনার লক্ষ্যে। নিজের দৃষ্টি ও ভাবনাকে সমাজ ও সমকালের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার যে প্রবণতা অরুণ মিত্রের ছিল তা জনমুখী ও সাংগঠনিক রূপ পেতে শুরু করল এই সময় থেকেই। সাম্যবাদী কবিতার ধারা তখনও স্ফীত হয়ে ওঠেনি তেমন। ১৯৩৯ এ 'অগ্রণী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'লাল ইস্তাহার' কবিতাটি সম্ভবত পথ-প্রদর্শক সন্মান পেতে পারে।"[১৫]

এই কবিতার পরে পরবর্তী কবিতাতেও আমরা পাই যুদ্ধ-ক্ষত এক দুঃসময়ের চিহ্ন। ১৯৪১ সালে যখন হিটলারের বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করে এবং শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার

কমিউনিস্টদের মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের কমিউনিস্টরা যাকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যা দিয়েছিল। সেই 'জনযুদ্ধে'র পরিপ্রেক্ষিতেই কবি অরুণ মিত্র লিখলেন 'কসাকের ডাক : ১৯৪২' -

"দুই হাজার মাইল দূরে

ঝড় উঠে মিলিয়ে গেল সুমেরু-শিখরে,

মিলিয়ে গেল তুন্দ্রার তুষার-শিবিরে,

ভালদাই পাহাড়ে

রক্তের দাগ শুকিয়ে এল বুঝি।

সাঁজোয়া থাবা বাড়িয়ে সেই বুড়ো জানোয়ার

ছিঁড়তে চেয়েছে হৃদপিন্ড,

বিশ্বাসঘাতী বাঘনখ প্রতিহত-

মস্কো...মস্কো।"

('কসাকের ডাক : ১৯৪২', 'প্রান্তরেখা')

কিন্তু কবি হেরে যাবার কথা কোথাও বলেননি তার প্রত্যয়দিপ্ত ঘোষণা-

"জান দিয়ে গড়লাম রুশিয়া

সোভিয়েট রুশিয়া

জান দিয়ে রাখব এ দুনিয়া

রাখবই

ভাই হো

তোমাদের দুনিয়াকে রাখব

রুখবই দুশমন রুখব

দোসরের মুখ চাই ভাই হো...

হাতিয়ার।"

('কসাকের ডাক : ১৯৪২', 'প্রান্তরেখা')

কিন্তু তিনি প্রথম জীবনে এরূপ কবিতা লিখলেও আমরা সকলেই জানি কবি অরুণ মিত্র কোনো দিনই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা কে মেনে নিতে পারেননি। তিনি নিজেও সে কথা বলেছেন-

"অরুণ মিত্র কিছুকাল আগে এক সাক্ষাতে বলেছিলেন: (১৩৪৮ শ্রাবণ, গাঙ্গেয় পত্রিকা): 'কমিউনিস্ট ঘোষণার সঙ্গে হয়তো সম্পর্কিত করা যায় এমন কবিতা প্রথম জীবনে গোটা তিনেক লিখেছি, তারপর আর লিখিনি। তাছাড়া কোন বিশেষ মতবাদের ভিত্তিতে কবিতা লেখায় আমি বিশ্বাসী নই।' তার পরেই বলেন, 'যদি বামপন্থা মানে হয় মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে ভাবনা, জীবনের সঙ্কট সম্বন্ধে অনুভূতি, নৈরাশ্য যন্ত্রণা ও অবক্ষয়ের চেতনা এবং তা উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা, তাহলে আমার কবুল করতেই হবে, আমি বামপন্থী কবি।"[১৬]

আসলে কবি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে রাজনীতির থেকে মানুষ অনেক বড়, তাইতো তিনি মানুষের অবস্থা নিয়ে, মানুষের জীবনের সঙ্কট নিয়ে ভেবেছেন, আর এই ভাবনার সাথে যদি কোন রাজনৈতিক দলের মতের

মিল ঘটে তাকেও তিনি অস্বীকার করেননি। আর তাই তাঁর কবিতায় পাই মানুষের কথা, মানুষের দুঃসময়ের কথা। তিনি বলেন -

"যখন পায়চারি ক'রে বাইরে আসি

তাজা তাজা মৃত্যু দেখি এধারে-ওধারে

কিন্তু কী আসে যায়?

এ-সব মৃত্যু আর মৃত্যু নয় আমাদের কাছে।

আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি নিজেদের,

স্বচ্ছ উত্তপ্ত অনির্বাণ জ্বলছি আমরা,

আগেকার সেই বশম্বদ ইচ্ছাগুলো আমাদের মধ্যে পুড়ে মরছে দেয়ালি

পোকার মতো,

আমাদের সারা কাঠামোয় আগুন হয়ে আছে মাত্র একটি উলঙ্গ ইচ্ছা:

উপরে নিশানা ক'রে ঠিক মাঝখানে মারব হাম্বর তুলে

খিঁচোনো রেখাগুলো খানখান হয়ে যাবে, একেবারে চুরমার গুঁড়োগুঁড়ো

হয়ে যাবে

তারপর ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি হয়ে নামবে।"

('ভ্রুকুটি', 'উৎসের দিকে')

এরপর আমরা এই কাব্যগ্রন্থের 'সঞ্জীবন' কবিতায় দেখব অধীন মানুষের বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতা সর্ম্পকে কবির অনুভূতি-

"করাতের দাঁত আমাদের রক্তাক্ত করেছে;

চামড়া ছিঁড়েছে, ছিঁড়ুক

মাংস চিরেছে, চিরুক

হাড় পর্যন্ত আঁচড় লেগেছে, লাগুক

আমরা বাঁচলাম।"

('সঞ্জীবন', 'উৎসের দিকে')

মানুষের কবি, কবি অরুণ মিত্র মানুষের দুঃখকে , মানুষের অস্থিরতাকে, মানুষের জ্বালা-যন্ত্রণাকে নিজের করে অনুভব করেছেন, এবং প্রতীক্ষায় রয়েছেন যে এই জ্বালা কখন জুড়াবে। তাই তিনি বলেন-

"এ জ্বালা কখন জুড়োবে?

গোমুখীর পাহাড়-চূড়ায় অন্ধকার উড়িয়ে এ কোন্ জয়ের উল্লাস! তার

তাড়নায় আঁকাবাঁকা সুতোলি নদী সাপের মতো মোচড়ায়। লাখ লাখ বুকের

তুষানলের আভায় কালো দিগন্তে পাড় বোনা, দুর্গের গড়ে সঙিনের চকমকির

ফুলকি আর রাজবাগিচায় জঙ্গলের চাউনি। আরো বলি চাই। অনেক তো

দেওয়া গেল, অনেক প্রিয়জনের পাঁজড় গুড়িয়ে গেল আচমকা তোপে। আর

কত। কবে আমার এই ধুলো পবিত্র বৃষ্টিতে ধোবে?

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?

কখন?"

('এ জ্বালা কখন জুড়োবে', 'উৎসের দিকে')

আমরা সকলেই জানি এবং এনিয়ে আগেও আলোচনা করা হয়েছে যে অরুণ মিত্র প্রথম দিকে যে ভাবে তাঁর কাব্য জীবন শুরু করছেন তিনি কিন্তু সেভাবেই এগিয়ে যাননি, তাঁর কবিতায় বারবার এসেছে পরিবর্তন, তিনি নিজেও সে কথা বলেছেন, তাও আমরা দেখছি। এখন আমরা তাঁর এই কাব্য-জীবনের পরিবর্তন সর্ম্পকে তরুণ সান্যাল কি বলেছেন তা একবার দেখে নেবো-

"ফরাসীদেশ ফেরৎ এলাহাবাদের ফরাসি ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক ও পঞ্চাশের দশকে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সদাব্যস্ত এই অরুণ মিত্র যে আলাদা মানুষ। প্রথমজন মার্কসবাদী ও জনযুদ্ধ বিশ্বাসী পার্টিমনস্ক কবি। অসমাপ্ত রেনেশাঁস সমাপ্ত করার জন্য দায়বদ্ধ। দ্বিতীয়জন মানুষের সামাজিক শোষণ থেকেই মুক্তি শুধু নয়, চৈতন্য,মন, মনন, হৃদয়াবেগ, আনন্দ, বেদনা, সুখ, ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ সব কিছুই অঙ্গীকৃত করে মানুষের মুক্তি সন্ধান করেছেন।"[১৭]

কবি প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের জীবনের সমস্যা, তাদের অভাব, কোলাহল, গ্লানি। কিন্তু এসব কে স্বীকার করেও তিনি সেসব থেকে ঊর্ধ্বে উঠে বলেছেন-

" ...এই দিন এবং এর আগের সবগুলো দিন

এবং সবগুলো সন্ধে আর রাত আমরা আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলাম।

আমরা কথা বলছিলাম। কথাগুলো যেন জুড়ে জুড়ে এক সাঁকো, তার উপর দিয়ে আমাদের সমস্ত ইচ্ছে সমস্ত বোঝাবুঝি পারাপার করছিল। কষ্ট কি ছিল না? ভীষণভাবেই ছিল। খাবারের দোকানের কাছে ভিখিরি ছেলেটা কোনো দিন আমাদের নজর এড়ায়নি। এবং ঘরে বাইরে যত যাচ্ছেতাই চিৎকার আমরা শুনেছি, সব আমাদের কানে লেগেছিল। তবু আমরা তাদের ছাপিয়ে উঠেছিলাম, এই সমস্তকে শুধরে-নেওয়া আর একটা সময়ের কথা আমরা ভাবছিলাম, বলছিলাম। ”

(‘গর্জনের সামনে’, ‘শুধু রাতের শব্দ নয়’)

আমরা একটু ভাল ভাবে লক্ষ করলে দেখব যে চল্লিশের দশকে কবিরা যখন চারপাশের পরিবেশ নিয়ে, অরাজকতা নিয়ে, হিংসা-বিবাদ, আর্তনাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠা, স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন তারা আশ্রয় নিয়েছেন, বলা ভাল এসব থেকে মুক্তির জন্য একটি সৎ নির্ভীক শিশুর খোঁজ করেছেন। তাইতো অরুণ মিত্র বলেন-

“আমি জনতার মধ্যে শিশুর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি

আমি কোলাহলের খরজে আমাকে বেঁধে নিয়েছি

এইতো নিঃশ্বাস নেওয়ার মত উচ্চারণ করেছি : মানুষ

আমি তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে পেরেছি

তুমি প্রসন্ন হও।”

(‘আর এক আরম্ভের জন্য’, ‘উৎসের দিকে’)

এরপর ‘ঘনিষ্ঠ তাপ’ কাব্যে এসে কবি সকলের সাথে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষের সাথে তাদের দুঃখ দুর্দশাকে নিজের করে নিতে চাইছেন। তাইতো তিনি ‘অন্তরঙ্গ’ কবিতায় বললেন-

“ঠাহর ক’রে দেখে বুঝলাম এই ভিড়ের মধ্যে যারা আছে তারা

প্রত্যেকেই আমার খুব অন্তরঙ্গ। প্রথম সকালটা আমি ভুলিনি। আমার সঙ্গে

হাত ধরাধরি করে সবাই বাইরে এসেছিল। মনে আছে সবুজ তোরণের

নীচে আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম।

(‘অন্তরঙ্গ’, ‘ঘনিষ্ট তাপ’)

কবিতার একদম শেষে এসে তিনি বললেন –‘তারা সব আমার রক্তের দোসর’ আর এখানেই যেন তিনি আর পাঁচজন কবির মত থাকলেন না, তিনি হয়ে উঠলেন একজন রিকশাওয়ালা, একজন মুটে, একজন সাধারণ দগ্ধ মানুষ, যে সমাজের জাতাকলে অনবরত পৃষ্ঠ হয়ে চলছে। তাইতো ‘রিকশাওয়ালা’ কবিতায় তিনি তুলে ধরলেন সেই রিকশাওয়ালার কথা যে বিষম ঠাণ্ডাতেও তার পরিবারকে অন্ধকারে রেখে সে বের হয়ে যায় শুধু মাত্র পেটের দায়ে। আর অরুণ মিত্র নিজে সেই রিকশাওয়ালার জায়গায় নিজেকে উপলব্ধি করে এই কবিতা লেখেন, কিন্তু খুবই চতুরতার সাথে তিনি সেই রিকশাওয়ালার বিপরীতে তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে না বসিয়ে তিনি সেখানেও নিজেকেই বসিয়েছেন। কবিতায় তিনি বলেন-

" ...যে-লোকটা চালায় একদিনও তার কামাই নেই, বিষম ঠাণ্ডাতেও না।

...সন্ধের পর ছেলে-বউকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সে বেরিয়ে পরে।

কোন মহল্লা থেকে তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। শুধু এইটুকু বুঝতে পারি,

ভুতুড়ে আলো গুলো পাড় হয়ে গেল এক প্রকাণ্ড যে শীতের রাত পড়ে তার

ওপারে সে থাকে। যেখানেই থাকুক কিছু আসে যায় না। আমার বাড়িটা

যে তার চেনা, আমাদের দু-জনের পক্ষে এটাই বড় কথা।"

('রিকশাওয়ালা', 'ঘনিষ্ট তাপ')

এরপর 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' কাব্যেও কবি সমকালীন সময় ও পরিসরকে অস্বীকার করতে পারেননি। সেখানেও তিনি তুলে ধরেছেন ষাটের দশকের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি। যে সমস্ত ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে অনিশ্চয়তা ও সংশয়ে ভরে উঠেছিল। চারিদিকে তখন বেকারত্বের জ্বালা, কবি অরুণ মিত্রও সেই জ্বালা দেখে এবং বেকারদের সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। তাই তিনি চল্লিশের দশকে যে মুষ্টিবদ্ধ হাতকে দৃঢ় করেছিলেন তা যেন এই দশকে এসে সেই সময়ের চাপে কিছুটা অসহায় হয়ে পড়ে। তাই কবি লেখেন-

"জবরদস্ত মুঠোটা

এখন সামনের গাছপালার দিকে খোলা

এবং গোটাকয়েক রেখা

ক্ষুধা আর মৃত্যুকে নিয়ে এলিয়ে পড়েছে।”

(‘মুঠোটা খোলা’, ‘মঞ্চের বাইরে মাটিতে’)

অন্যান্য কবির মতো কবি অরুণ মিত্র কবিতায় তেমন ভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন না। কিন্তু সময় যে মানুষকে তার সংকল্পে স্থির থাকতে দেয় না তারই প্রমান ‘পতুল নাচ’ কবিতাটি। সময় মানুষকে যেন পুতুল বানিয়ে দিয়েছে। সময় মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব, নীতি-আদর্শ সবকিছুকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সে যেন সময়ের হাতের দাস হয়ে গিয়েছে। সময় যেন তাকে অনবরত নাচিয়ে চলছে, তিনি এও বলেন এই নাচ কোন মঞ্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তা যেন আমাদের চারপাশের ঘরে-বাইরেই অনবরত হয়ে চলছে। কবিতায় তিনি বলেন-

“পুতুলরা এখন রীতিমতো মানুষ

ওদের নাচ চব্বিশ ঘন্টাই চলছে,

মঞ্চটঞ্চ নেই, খুব ঘনিষ্টভাবে

ঘরে বাইরে : আস্তানায় এবং জমায়েতে।

যদি কোন সময় কাউকে ছোঁও

নিশ্চয় তাপ টের পাবে

এবং দৈবাৎ কারো চোট লাগলে

হয়তো রক্তও পড়বে,

পুতুলদের শরীর মানুষের মতো হয়েছে,

হাত পা যতই সুতোর টানে নড়ুক

যথেষ্ট আবেগ ফোটাতে পারে,

আরো আশ্চর্য, ওরা কথা বলতে শিখেছে

মজার মজার কথা

ছুঁড়ে দিলে জাঁদরেল মানে দাঁড়ায় এমন সব কথা।"

('পুতুল নাচ', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে')

আসলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকথেকে মানবজীবনকে, জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা কে অনুভব করেও যে মানবিকতার বোধে পৌঁছানো যায় তাই দেখিয়েছেন আমাদের কবি অরুণ মিত্র। তাঁর গদ্য-কবিতা সর্ম্পকে বলতে গিয়ে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন -

"চল্লিশের দশক থেকেই অরুণ মিত্র বেছে নিয়েছিলেন গদ্য অনুচ্ছেদে কবিতা লেখার রীতি, ... 'ঘনিষ্ট তাপ' (১৯৬৩)_তে এই রীতিটিই প্রধান। কারও অনুকরণ না হলেও ফরাসি কবিদের এইজাতীয় কবিতা থেকেই তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন। ফরাসি কবিতায় নিরূপিত ছন্দের কাঠামো ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়েছিল বোদলেয়র-এর সময় থেকেই। তবে অরুণ মিত্র-কে সম্ভবত এ পথে টেনেছিলেন তাঁর প্রিয় কবি র‍্যাবোঁ যাঁর 'নরকে এক ঋতু' গদ্যে লেখা কবিতার এক অপরূপ নিদর্শন। ফরাসি কবিতার এ ধারা কোনওসময়েই স্তিমিত হয়নি। ফরাসি গদ্য-কবিতার ভাষায় আবেগমগ্নতা যেমন গভীর, ভাব প্রকাশরূপে একটা যৌক্তিক ছাঁচও একই সঙ্গে দুর্লক্ষ্য নয়। অরুণ মিত্রের কবিতার রূপাবয়ব ও ছন্দেও সেই গুণটি বর্তেছে। তা একই সঙ্গে জাগ্রতও রাখে, মগ্নও করে।"[১৮]

এরপর আমরা ‘শুধু রাতের শব্দ নয়’ কাব্যে আমরা পাই কবির নাতনি বুলাকে। যে সুধীন্দ্রনাথের স্বর্ণকেশিনী বা জীবনানন্দের বনলতা সেনের মতো কোন রহস্যময়ী নারী নয়। জানা যায় কবি পরিবারে এই নাতনির সাথে বেশ ঘনিষ্ট ছিলেন আর তাঁর কথা বলতে গিয়েই জড়িয়ে পরে বাইরের জগৎ, জীবন, অন্ধকার, সংগ্রাম, যুদ্ধ। তাইতো তিনি বলেন -

“আমাকে স্বস্তির কথা কে বলবে? আমার দিন আর রাতগুলোয় বাঘনখ বসা।

ছেলেমেয়েদের এত আনন্দ আছে আমি ভাবি, কিন্তু খেলনা বাগান আর

টাপুরটপুর ভাবতে ভাবতে আমি ঝলসানো ঘাসের উপরে গিয়ে পড়ি। তখন

উনুনে ভাত ফোটার সময়। এত মুখে জোগাবার ধান সে-মাটিতে আর তো

জন্মায় না। সেখানে বসে প্রবোধ দিতে আমার সমস্ত রক্ত হিম হয়ে আসে।

আর জোড়া জোড়া চোখ আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে। একের পর এক,

অন্তহীন মিছিল।

ভালোবাসার জন্যে আমার বুকের দুই বাতায় অভ্যর্থনা টাঙিয়ে রাখি।

শিশু সেখানে হাত টুইয়ে আস্তে আস্তে মাথা রাখে। একঘর স্বপ্ন তার

চোখের পাতার উপর, তার ঠোঁটের বাঁকে। কিন্তু যুদ্ধের দামামা কাছে আসে।

আমি তা চাপা দেবার জন্যে যত স্নেহের ঢেউ তুলি, দেওয়ালের ইঁটে তত জোর

হুমকি ওঠে। আর দুই বুকের উপর এসে কাঠি পড়ে। আমার হৃৎপিণ্ডের

শব্দে শুধু হায় হায়।

আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে?

দ্যাখো না হয় হাসিমুখ বুলা হটাৎ হটাৎ কী যন্ত্রণায় মূর্তী হয়!"

('স্বস্তির কথা কে বলবে', 'শুধু রাতের শব্দ নয়')

অরুণ মিত্র ছিলেন মানুষের কবি তাইতো তিনি কুৎসিত সমাজ থেকে বের হতে চেয়েছেন এবং স্বস্তির পথ খুঁজেছেন। মানুষকে নিয়েই ছিল তাঁর কারবার। এমন কি তিনি শিল্পের জন্যই শিল্প একথাও বিশ্বাস করতেন না। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন-

"আমি লিখেছি আর লেখার সঙ্গে সঙ্গে, আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রত্যয় ও বিশ্বাস জন্মেছে। সেই বিশ্বাস হল, এক শিল্পের আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয়, যাঁরা বলেন, শিল্পের জন্য শিল্প, তাঁরাও কথাটাকে বিশ্বাস করেন না। আমি মনে করি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কহীন ভাবে বক্তব্য বিষয় প্রাণীজগৎ হতে পারে? বিশ্বচরাচর হতে পারে, আমি মানুষের হয়ে লিখেছি, মানুষের জন্য লিখেছি।এই অনুভবই আমাকে জাগিয়ে তুলেছে বারবার।"[১৯]

যদিও তাঁর প্রথম দিকে নিজের লেখা নিয়েই তিনি দ্বিচারিতায় ভুগেছেন। কারণ তাঁর প্রথম দিকে তিনি যখন লিখতেন তখন দেশের অবস্থা ভাল ছিল না আর তাঁর লেখার ধরণটাও ছিল আলাদা তাই তিনি আর লিখবেন কি না এই নিয়েও সংশয়ে ছিলেন, যদিও পরে নিজেই আবার সিদ্ধান্ত নেন যে লেখবেন। আসলে অরুণ মিত্রের দেশের জন্য, দশের জন্য কিছু করার মানসিকতা ছোটোবেলা থেকেই ছিল। তাই এক সময় কবিতা লিখাতে ভাটা

পড়লেও সেই ভাটা বেশিদিন থাকে না। তিনি নিজে শুভব্রত চক্রবর্তী ও রামকিশোর ভট্টাচার্যকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে এ কথা বলেন -

*"তখন তো একটা অন্য অবস্থা ছিল, অন্য পরিস্থিতি ছিল- পরাধীনতা, ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই সব আচ্ছন্ন করে রাখত। মনে হত কবিতা লিখে তো দেশ স্বাধীন করতে পারবো না। তাই কবিতা লেখার ব্যাপারে খানিকটা বিরতই থাকতাম। কিন্তু, পরে অবশ্য মনে হলো এটাও ছেলেমানুষি, কারণ আমার লিখতে যখন ইচ্ছে করছে লিখব না কেন? সব কথাই তো কবিতায় বলা যায়। সেই জন্য কিছুদিন বিরতির পর আবার আরম্ভ করি লিখতে।"*২০

এইছিল অরুণ মিত্র। আর এভাবেই তিনি কবিতায় তুলে ধরলেন তাঁর মনের সব কথা। যা আজও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে রয়েছে। আর এই ভাবেই নিজের কথা বলতে বলতে স্ত্রী শান্তিদেবীকে হারানোর দুই বছর পর অরুণ মিত্র হটাৎই একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবং ২০০০সালের ২২আগষ্ট ভোর চারটের সময় কলকাতায় মেয়ের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর আগের মুহূর্তের কথা বলেছেন খালেদ চৌধুরী এভাবে-

"২০শে আগস্ট দেখতে পেলাম, প্রচণ্ড শ্বাস কষ্ট হচ্ছিল, ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে লক্ষ্য রাখছেন, এমন সময় যখন একটু কষ্টটা কম, মেয়ে উমা বলল, বাবা খালেদকাকা, অনিল আচার্যরা তোমাকে দেখতে এসেছে। বললেন ডাকো ওদের। আমরা তক্ষুনি গেলাম, আমি পাশে বসে গায়ে হাত বুলাচ্ছিলাম, প্রথমেই আমার এবং রণজিৎ সিংহের কুশল সংবাদ নিলেন তারপরই অনিল আচার্যকে বললেন জানো, আমার মাথায় এখন শুধু কবিতা ভিড় করছে। আমি এখন ডিকটেট করতে পারি বলে তিন লাইনের একটি কবিতা বলে গেলেন এক নিঃশ্বাসে, কবিতাটি অনিল আচার্য লিখে নিয়েছে। কবিতাটির প্রথম লাইনটা আমি বুঝতে পারিনি, দাঁত পরা ছিলনা, তার উপর

এই শ্বাস কষ্ট। দ্বিতীয় লাইনটা হল-"আমার ভিতরে জ্বলন্ত লাভা ফুটছে, জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাক।" সঠিক ভাষ্য অনিল আচার্যের কাছে আছে।"[২১]

এই বর্ণনা শুনে আমাদের আর বুঝতে বাকী থাকে না যে কবি অরুণ মিত্রের কবিতার প্রতি কি প্রেম ছিল। যিনি জীবনের শেষ মুহূতেও কবিতা আওড়ে চলছেন। মানুষের কবি, কবি অরুণ মিত্র, জীবনের কবি, কবি অরুণ মিত্র, ভালোবাসার কবি, কবি অরুণ মিত্র। তাইতো ঈশ্বরে অবিশ্বাস করা কবি, তবু কখনো যদি ভুল করে ঈশ্বরের দেখা পান, তার কাছেও তিনি চেয়েছেন সেই মানুষের উপকার করার শক্তি। সাক্ষাৎকারে তিনি শেষ প্রশ্নের উত্তর এভাবেই দিয়েছিলেন-

"তা সত্বেও যদি বলো কি বর চাই তাহলে বলবো আমার দ্বারা জীবিত বা মৃত অবস্থায় যদি মানুষের একটুও উপকার হয় সেই ব্যবস্থা করে দাও। অর্থাৎ জীবিত বা মৃত অরুণ মিত্রকে মানুষের যদি কোনো কাজে লাগানো যায়, সেই বর দাও।"[২২]

আর আমাদের মনে হয় ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হলেও তিনি হয়তো সেই বরই পেয়েছিলেন, কারণ তিনি জীবিতকালে তো মানুষের উপকার করেগেছেনই, মারা যাবার পরেও তার শরীর নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে বিজ্ঞানের কাজে ব্যবহারের জন্য শায়িত রয়েছে।

আমরা শেষ করবো তারই লেখা 'দুচোখের পাতা বুঁজে যাওয়ার পর' কবিতা দিয়ে-

"আমার দুচোখের পাতা যখন বুঁজে যাবে

তখন কেউ যেন অস্থির না হয়। আমি যে সময়

নিশ্চিন্তে ছবি দেখছি। মাঠ, ঘাট, গাছপালা,

লোকজন, পাখির ঝাঁক, পশুর পাল যারা

সকলেই আমার খুব চেনা খুব আপন।

সেই সব ছবি কথা বলবে আমার বুকের

মধ্যে। সে-কথা বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ ছাড়িয়ে অবশেষে ছড়িয়ে যাবে

আমার কবিতায়। আমার চোখে তখন

ছবির শব্দ, আমার ভাষার ধ্বনি।

চোখের পাতা বুঁজে যায় যাক। তা নিয়ে

আমার কী ভাবনা? সেখানে তো আমি

রেখেই দিলাম আমার বাংলাকে

চিরকালের জন্যে।”

(শেষলেখা)

তথ্যসূত্র:-

১। শিলিন্ধ্র, প্রথম প্রকাশ:১৩৭৩/১৯৬৬, পঞ্চত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৪০৭, অরুণ মিত্র সংখ্যা, সম্পাদনা- কমল মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা-৯

২। তদেব, পৃষ্ঠা-১০

৩। তদেব, পৃষ্ঠা-১০-১১

৪। তদেব, পৃষ্ঠা-১১

৫। অরুণ মিত্র, পবন সাহা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২ নভেম্বর ২০০৯, পৃষ্ঠা-৬০

৬। শিলিন্ধ্র, প্রথম প্রকাশ:১৩৭৩/১৯৬৬, পঞ্চত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৪০৭, অরুণ মিত্র সংখ্যা, সম্পাদনা- কমল মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা-১২

৭। তদেব, পৃষ্ঠা-১৩

৮। তদেব, পৃষ্ঠা-১২

৯। অরুণ মিত্র, পবন সাহা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২ নভেম্বর ২০০৯, পৃষ্ঠা-১৭

১০। শিলিন্ধ্র, প্রথম প্রকাশ:১৩৭৩/১৯৬৬, পঞ্চত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৪০৭, অরুণ মিত্র সংখ্যা, সম্পাদনা- কমল মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা-১৪

১১। তদেব, পৃষ্ঠা-২৯

১২। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা-২৭

১৪। আধুনিক কবিতার নিবিষ্ট পাঠ, চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ৯মে ২০০৯, অক্ষর প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৯৪

১৫। রবীন্দ্রোত্তর আলোকবৃত্তের তেরোজন কবি, দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ মে ২০১২, এবং মুশায়েরা, পৃষ্ঠা-১৮১

১৬। 'মার্কসবাদ ও বাংলা কবিতা'-কবিতার মুখোমুখি, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৫, এবং মুশায়েরা, পৃষ্ঠা-৪২

১৭। শিলিন্ধ্র, প্রথম প্রকাশ:১৩৭৩/১৯৬৬, পঞ্চত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৪০৭, অরুণ মিত্র সংখ্যা, সম্পাদনা- কমল মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা-২৯

১৮। অরুণ মিত্র, পবন সাহা, প্রকাশ ২নভেম্বর ২০০৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃষ্ঠা-৭৩

১৯। শিলিন্ধ্র, প্রথম প্রকাশ:১৩৭৩/১৯৬৬, পঞ্চত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৪০৭, অরুণ মিত্র সংখ্যা, সম্পাদনা- কমল মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা-১৪২

২০। তদেব, পৃষ্ঠা-৯৪

২১। তদেব, পৃষ্ঠা-৩৪

২২। তদেব, পৃষ্ঠা-১০৯